হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব। মহান প্রভু তাঁর অপার করুণায় বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন' তথা নিখিল বিশ্বের করুণার ছবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানবীয় চরিত্রে যত মহৎ গুণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে, অনিন্দ্য সুন্দরতম যা কিছু মহৎ গুণের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারে, বিশ্বনবীর (সা) পূত জীবন চরিত্রে তার পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল।

বিশ্বনবী ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু এবং শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মত সকল ক্ষেত্রে এমন সফল সংস্কারক আর কাউকে দেখা যায় না। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য অনিন্দ্য সুন্দর অনুসরণীয় শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন। যা প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে পথ দেখাবে। এ ইউনিটে হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষার কিছু দিক আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের আলোচিত পাঠগুলো হলো-

পাঠ-১ : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ।

পাঠ-২ : হযরত মুহাম্মদ (স) এর ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কার।

পাঠ-৩ : হযরত মুহাম্মদ (স) এর অর্থনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কার।

পাঠ-৪ : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক শিক্ষা।

পাঠ-৫ : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক শিক্ষা।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহানবীর (সা) দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাসুলের আদর্শে জীবন গঠন করতে পারবেন।

১.১ জীবনাদর্শ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব। মহান প্রভু তাঁর অপার করুণায় বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন' তথা নিখিল বিশ্বের করুণার ছবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানবীয় চরিত্রে যত মহৎ গুণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে, অনিন্দ্য সুন্দরতম যা কিছু মহৎ গুণের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারে, বিশ্বনবীর (সা) পুত জীবন চরিত্রে তার পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল।

মহান আল্লাহ তাই তাঁর প্রশংসায় ঘোষণা করেন-

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি উন্নততম চরিত্রের ধারক।" তার পুত-জীবন চরিত্র হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য উৎকৃষ্ঠতম আদর্শ। এ মর্মে মহান প্রভু ঘোষণা করেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবন চরিত্রে রয়েছে উৎকৃষ্টতম আদর্শ।"

আল্লাহতে বিশ্বাস ও ভরসা

বিশ্বনবীর (সা) চরিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ভূষণ ছিল আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং যাবতীয় বিপদে-বিষাদে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহতে নির্ভরতা ও ভরসা।

মহানবীর (সা) জীবনাদর্শই ছিল আল-কুর'আন। হযরত আয়েশার (রা) ভাষায় : "তিনি ছিলেন আল-কুরআনের মূর্ত প্রতীক।" তিনি তাঁর জীবনে আল-কুরআনের প্রতিটি অনুশাসনের রূপায়ন ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে জীবন্ত কুরআনও বলা হয়।

ন্যায় পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতা মহানবীর (সা) জীবনের এক উজ্জ্বলতম আদর্শ। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তিনি যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের মিশন। বিচারে তিনি ধনী-নির্ধন, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র, স্বজাতি-বিজাতি, অভিজাত-ইতর, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভৃতির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেননি। চুরির অপরাধে অভিজাত কুরাইশ বংশীয়া এক রমণীর হাত কাঁটা নিয়ে কথা উঠলে তিনি কঠোর ভাষায় ঘোষণা করলেন : "যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও (রা) চুরি করতো, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর হাতও কেটে দিতাম।"

আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা

হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন মহান আমানতদার ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক। তাঁর অকৃত্রিম বিশ্বস্ততার গুণে বিমুগ্ধ আরব তাঁর নিকট তাদের ধন-সম্পদ, সোনা-দানা গচ্ছিত রাখতো। তিনি গচ্ছিত সম্পদ অতি যত্নের সাথে হিফাযত করতেন এবং চাহিবামাত্র তার মালিককে যথার্থভাবে প্রত্যার্পণ করতেন। এ মহতী গুণের কারণেই মানবতার চরম দুর্দিনেও তিনি শত্রুমিত্র সকলের নিকট 'আল-আমীন' ও 'আল-সাদিক' এর দুলর্ভ উপাধিতে বিভূষিত হন।

ওয়াদা ও অংগীকার পালন

ওয়াদা পূরণ বা অংগীকার পালন করা নবী চরিত্রের (সা) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিশ্রুতি বা অংগীকার পালন না করা তিনি জঘন্যতম পাপ বলে অভিহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন– "যে অংগীকার পালন করেনা তার ধর্ম নেই।" তাই তিনি নির্দেশ দেন- তোমরা যখন অংগীকার করবে তখন তা পালন করবে।"

সত্যবাদিতা

বিশ্বনবীর (সা) জীবনাদর্শ ছিলো সততা ও সত্যবাদিতায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন সত্যবাদিতার জীবন্ত প্রতীক। তিনি সর্বদা সত্য বলতেন, সত্যের অনুসরণ করতেন। জীবনের কোন কঠিন অবস্থায়ও তাঁকে মিথ্যার ছোঁয়া স্পর্শ করতে পারেনি। সেই শৈশব হতে তিনি বর্বর আরবের বুকে সততার গুণে 'আল্-সাদিক' বলে সকলের প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন- "সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।"

ধৈর্য সহিষ্ণুতা

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল মহানবীর (সা) চরিত্রের অলংকার। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিন বহু বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অবর্ণনীয় নির্যাতন নি□ষণ অম্লান বদনে সহ্য করেছেন, কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্য হতে কখনও বিচ্যুত হননি। চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি এতটুকু ধৈর্য হারা হননি। তিনি মহান প্রভুর ওপর অটল বিশ্বাস ও ভরসা রেখে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে চরম কঠিন মুহূর্তের মোকাবেলা করেছেন। তিনি ধৈর্যের ব্যাপারে ঘোষণা করেন - ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম-অধিকতর কল্যাণকর জিনিস আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি।"

বিনয় ও নম্রতা

বিনয়-নম্রতা ও কোমলতা ছিল মহানবীর (সা) চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তিনি সকলের সংগে অতীব কোমল ব্যবহার করতেন। জীবনে কোন দিন তিনি কারো সংগে রূঢ়-আচরণ কিংবা কটু বা শক্ত কথা দিয়ে এতটুকুন কষ্টও দেননি। দাস-দাসী এমনকি, চরম শত্রুরাও তাঁর বিনম্র ব্যবহারে বিমুগ্ধ ছিলো।

ক্ষমা ও ঔদার্য

'ক্ষমা যে মহত্ত্বের লক্ষণ' এ গুণটি মহানবীর (সা) জীবন চরিত্রের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমা ও ঔদার্যের মূর্ত প্রতীক। প্রাণঘাতী শত্রুকেও তিনি সহাস্য বদনে ক্ষমা করে দিয়েছেন। মক্কা ও তায়েফ বিজয়ের সময় তিনি ক্ষমার যে স্বর্ণোজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিশ্বের বুকে ক্ষমার যে আদর্শ রেখে গেছেন তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

আর্ত মানবতার সেবা

আর্ত মানবতার দরদী বন্ধু মহানবীর (সা) জীবনটাই ছিল দীন-দুঃখী, ইয়াতীম, অসহায়, দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিবেদিত। তিনি ছিলেন গরীব-দুঃখীদের অকৃত্রিম আপনজন। তিনি জীবনে কখনও অভাবী ও সাহায্য প্রার্থীকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেননি। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বদা তিনি অসহায় মানুষের পাশে থাকতেন। মানবেতিহাসে তাঁর মতো মানবতার কল্যাণকামী ও দীন-দরদী বন্ধু খুঁজে পাওয়া যায় না।

আড়ম্বরহীন জীবন

মহানবী (সা) সহজ-সরল সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। বিলাসিতা, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনাচার তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। দরিদ্রতা আর প্রাচুর্য উভয় অবস্থাতেই তিনি ছিলেন সহজ-সরল ও নিরহংকার।

উদারতা

উদারতা ছিল নবী চরিত্রের ভূষণ। সংকীর্ণতা তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। শত্রু-মিত্র, আপন-পর সকলের প্রতিই তিনি ছিলেন আকাশের মত মুক্ত-উদার।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং তিনি নিজ হাতে কাজ করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি শিখিয়েছেন কাজ তা যতই ছোট হোকনা কেন সেটা আমানত স্বরূপ। নিজ হাতে জীবিকার্জনকে পুণ্যের কাজ বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর অবদান বিশ্ববাসী চিরকাল স্মরণ করবে।

বদান্যতা

মহানবী (সা)-এর বদান্যতা ছিল অকৃত্রিম। দয়া ও দানশীলতা তার চরিত্রের ভূষণ। তিনি আপন-পর, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য মুক্তহস্তে দান করতেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজ সম্পদ এবং স্ত্রী খাদিজার (রা) দেয়া অঢেল সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

১.২ দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনাদর্শ

মহানবীর (সা) দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনে সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন, ওঠা-বসা, মেলা-মেশা, পোষাক-পরিচ্ছদ, পানাহার প্রভৃতি সবকিছুতেই অনুপম আদর্শের প্রোজ্জ্বল শোভা পরিলক্ষিত হতো। যেমন-

কথা-বার্তা

নবী করীম (সা) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় ধীরস্থিরভাবে কথা-বার্তা বলতেন। বিনা প্রয়োজনে এবং অতিরিক্ত ও অযথা কথা বলতেন না। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করণার্থে করার জন্য প্রায়ই তিনবার করে বলতেন।

পানাহার

মহনবীর (সা) পানাহারে ছিল আদর্শের উজ্জ্বল নমুনা। তিনি খাদ্য গ্রহণের সময়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে সম্মুখ ভাগ থেকে অত্যন্ত আদয়ের সাথে বসে খেতেন। তিনি কোন খানা উচ্ছিষ্ট ও অচপয় করতেন না। পেটের কিছু ক্ষুধা রেখেই খাওয়া শেষ করতেন। পানি গ্রহণের সময় এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পানি পান না করে ধীরে ধীরে পান করতেন, যম যম ও ওযুর পানি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে তিনি বসে পান করতেন।

চলাফেরা

হযরত মুহাম্মদ (সা) অতিশয় শান্ত-শিষ্ট ও ভদ্রভাবে আনত নয়নে চলাফেরা করতেন। তাঁর চলাফেরায় কোনরূপ চঞ্চলতা কিংবা অলসতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি।

ওঠা-বসা

হযরত নবী করীম (সা) নতজানু হয়ে অতীব বিনম্রভাবে বসতেন। বসা অবস্থা থেকে কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সে স্থানে নিজে বসতেন না। উঠা-বসায় আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি আগন্তুক ব্যক্তিকে বসবার স্থান করে দিয়ে বসার শৃংখলা বজায় রাখতেন।

পোষাক-পরিচ্ছদ

পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে মহানবী (সা) উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই মার্জিত, রুচিশীল। শালীন ও স্বাভাবিক। সাধারণ তহবন্দ, জামা ও চাদর পরিধান করতেন। মাথায় টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার করতেন। আল্লাহ ও রাসূলের নামাংকিত রৌপ্য নির্মিত আংটি যা সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন। জাঁকজমকপূর্ণ চাকচিক্যময় ও অহংকার প্রকাশ পায় এমন পোষাক পছন্দ করতেন না।

সালাম-সম্ভাষণ

মহানবী (সা) চলতে-ফিরতে, রাস্তা–ঘাটে, বাড়িতে, মজলিসে সবখানেই কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে হাসিমুখে সালাম জানাতেন, কুশলাদি বিনিময় ও সম্ভাষণ করতেন। সালামের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদাই অগ্রণী। তিনি বলেছেন- "পরিচিত হোক অপরিচিত হোক সকলকে সালাম দেবে।"

হাসি

মহানবী (সা) আনন্দ সুন্দর ও পরিমিতভাবে হাসতেন- যাতে ভদ্রতা, সৌজন্য, আদব ও গম্ভীরতা এবং আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠতো। কখনো উচ্চস্বরে বা অট্টহাসি দিতেন না। তিনি বলেন- "যে হা হো করে হাসে তার উপর আল্লাহর লা'নত।"

শয়ন ও নিদ্রা

নবী করীম (সা) শয়ন ও নিদ্রার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর শয়ন গৃহ বিছানা খুবই সাদাসিধে ধরনের ছিল। তিনি ডান কাতে হাত গালের নিচে রেখে শুতেন। শোবার আগে অযূ করে এবং কুরআনের আয়াত ও দু'আ পাঠ করে শুতেন।

বাহ্য-প্রসাব

মহানবী (সা) বাহ্য-প্রসাব করার ব্যাপারেও আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। কা'বা শরীফকে সম্মুখ বা পেছনে ফেলে, রাস্তার ধারে, গাছের নীচে, পানির ঘাটে বাহ্য-প্রসাব করতেন না। বাহ্য-প্রস্রাবের পর বেজোড় সংখ্যক ঢিলা কুলুফ ব্যবহার করে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে উত্তমরূপে পাক-পবিত্র হতেন।

লজ্জাশীলতা :

প্রিয় নবীর (সা) সর্বোত্তম আদর্শ ছিল তাঁর লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তিনি বলেন– "লজ্জা হলো ঈমানের অংগ।"

সার-সংক্ষেপ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর প্রতিটি বাণী, কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচরণ এবং তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও তৎপরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ঠতম অনুসরণীয়, অনুকরণীয় আদর্শ। একটি অনুপম আদর্শ ও চরিত্রে যতগুলো মহৎগুণ প্রয়োজন মহানবীর (সা) চরিত্রে তার সবগুলোরই অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর উৎকৃষ্টতম আদর্শের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর অনুপম আদর্শে বিমুগ্ধ মানুষ দলে দলে ইসলামের স্নিগ্ধ শীতল পতাকাতলে সমবেত হয়ে তার আদর্শে নিজেদের জীবনকে স্বর্ণোজ্জ্বল করে গড়ে তুলেছিল। মানব জীবনের প্রতিটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠতম ও অনিন্দ্য সুন্দর অনুসরণীয় আদর্শ উপহার দিয়ে গেছেন, যা প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব কে?
২. মানবীয় চরিত্রে যত মহৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য হতে পারে, অনিন্দ্য সুন্দরতম যা কিছু মহৎ গুণের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারে, তার পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল, এমন মহান কোন চরিত্র ব্যক্তির?
৩. "নিশ্চয়ই আপনি উন্নততম চরিত্রের ধারক"- কাকে উদ্দেশ্যে করে কে বলেছেন?
৪. "তিনি ছিলেন আল-কুরআনের মূর্ত প্রতীক" কে কার সম্বন্ধে এ উক্তি করেছেন?
৫. চুরির অপরাধে অভিজাত কুরাইশ বংশীয় এক মহিলার হাত কাটা নিয়ে কথা উঠলে মহানবী (সা) কি বলেছিলেন?
৬. মহানবী (সা) শত্রুমিত্র আরবের সকলের কাছে কোন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন?
৭. প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে কার আদর্শ চির ভাস্বর?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মাদ (স) এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করুন।
২. মহানবীর (সা) দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনের আদর্শের বিবরণ দিন।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর ধর্মীয় শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্মীয় শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মীয় ক্ষেত্রে মহানবীর (স) সংস্কার উল্লেখ করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ধর্মীয় শিক্ষা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু এবং শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। বিশ্বনবীর (সা) আবির্ভাবকালীন সময়ে এবং তার পূর্বে বিশ্বের সর্বত্র চলছিল ধর্মীয় অবস্থার দুর্দিন। কোথাও তাওহীদের শিক্ষা ছিল না। ব্যক্তিপূজা, প্রকৃতিপূজা, জড়পূজা এবং কল্পিত দেবদেবীর পূজার তাণ্ডব লীলায় সর্বত্র মানবতার চির উন্নত শির নত হচ্ছিল তুচ্ছ জিনিসের পাদমূলে। মানবতা ও ধর্মের এহেন শোচনীয় দুরাবস্থার সন্ধিক্ষণে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা বিশ্বগুরু ও সংস্কারক হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আবির্ভূত করেন। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার সংস্কার ও অবদান বিশ্বের ইতিহাসে চিরঅম্লান ও দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কারে মহানবীর (সা)-এর শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বস্রষ্টা মহান একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একাত্ববাদের শিক্ষা প্রথিবীর কোথাও ছিলনা। মহানবী (সা) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে আহ্বান করলেন মহান স্রষ্টার একত্ববাদের দিকে। ঘোষণা করলেন :

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, আইনদাতা ও নিয়ন্তা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহরই রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভূত্ব। মহানবী (সা)-কে আল্লাহ তার সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : "সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই।" তিনি মহানবীকে (সা) আরো ঘোষণা করতে বলেন -

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

"আপনি বলুন! আল্লাহ একক সত্তা। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।"

২. শিরকতন্ত্রের অবসান

মহানবী (সা) যুগ যুগ ধরে লালিত পৌত্তলিকতা ও শিরকতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানেন। অসংখ্য দেব-দেবতা ও মূর্তি রক্ষিত পবিত্র কা'বা গৃহ আবার পুতপবিত্র হয়ে মহান আল্লাহর তাওহীদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করলেন। বহুকালের ওহীজ্ঞান বর্জিত নিরক্ষর, বর্বর আরব জাতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাওহীদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাদের শিক্ষাগুরু মানবতার মূর্ত প্রতীক মহানবীর (সা) আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে তাওহীদে উজ্জীবিত জাতিতে পরিণত হলো।

জাহিলী যুগে লোকদের বিশ্বাস ছিল, সমাজে যারাই প্রভাবশালী ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী তারাই শ্রেষ্ঠ তারাই সম্মানিত। তারা যা, খুশি করতে পারে তাদের অন্যায় ও পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা। মানবতার মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণার চির অবসান ঘটিয়ে আল কুরআনের ঘোষণা শোনালেন-

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক খোদাভীরু।"

৩. যাযকতন্ত্রের অবসান

অন্ধকার যুগে একশ্রেণীর লোকদের ধারণা ছিল, ভাল কাজ করলেই স্বর্গে যাওয়া যাবে না, বরং স্বর্গের চাবিকাঠি একমাত্র ধর্মযাযকদের হাতে। তাদের খুশী করতে পারলে স্বর্গে যেতে কোন অসুবিধা হবেনা- যত পাপই করা হোকনা কেন। এহেন অলীক ধারণার অবসান ঘটিয়ে নবী করীম (সা) কুরআনের বাণী শোনালেন- "সেদিন কেউ কারো কোন উপকারে

আসবেনা; একে অন্যের কোন বোঝাও গ্রহণ করবেনা। এমনকি, কেউ কারো জন্য কোনরূপ সুপারিশ করলেও তা গ্রহণ করা হবেনা।"

মুক্তির দিশারী নবী মুহাম্মদ (সা) অজ্ঞ যুগের আরেকটি অন্ধ বিশ্বাস- 'জন্মান্তরবাদ'- 'মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে পৃথিবীতে পূর্বকৃত কর্মফল ভোগ করার জন্য আবার আগমণ করবে' বিদূরিত করে ঘোষণা করলেন- "কোন মানুষই মৃত্যু বরণের পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেনা। বরং শেষ বিচার দিবসে হিসেব- নিকেশ দিতে পুনরুত্থিত হবে এবং স্বীয় কর্মফল অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

৪. পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস

মহানবীর (স) আগমন পূর্ব যুগে মানুষেরা মৃত্যুর পর হাশর, পুনরুত্থান, কিয়ামত, বেহেস্ত, দোযখ, তথা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করতো না। মহানবী (সা) শিক্ষা দিলেন, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর সবাই পুনরুত্থিত হবে এবং কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে।

ইয়াহুদ ও নাসারাদের ধারণা ছিল তারা যতই পাপ কর্ম করুক না কেন, তাদের শাস্তি পেতে হবেনা; পেলেও মাত্র চল্লিশ দিন কিংবা অল্প কয়দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন যীশু। মহানবী (সা) তাদের এ অলীক ও মিথ্যা ধারণার অপনোদন করে ঘোষণা দিলেন- কুরআনের বাণী "একের বোঝা অন্যে বহন করবে না।"

৫. সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস

মহাবনী (সা) শিক্ষা দিলেন- বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রাসূলের প্রতি সমানভাবে ঈমান আনতে হবে; কারো ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা চলবে না। কুরআনের ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন-

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ

"আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা।"

৬. আল্লাহর ইবাদত

মহানবী (সা) মানব জাতিকে শিক্ষা দিলেন আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকারের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যাবতীয় গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে মানব জাতিকে তিনি এক আল্লাহ ইবাদতের দিকে নিয়ে আসলেন।

মহানবী (সা) মহান স্রষ্টার ইবাদত-বন্দেগীতে যেন জীবনব্যাপী ব্যাপৃত থাকতে পারে সে ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামী শরীয়তের মূল শিক্ষা কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কে তাদের এমনিভাবে শিক্ষা দিলেন- যা প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনকে এক নতুন আলোর পথের সন্ধান দিলো।

০ নামাযের শিক্ষা

মহানবী (সা) নামাযের মাধ্যমে অত্যন্ত বিনয়াবনতভাবে মহান স্রষ্টার সমীপে তারই সৃষ্টিজীব হিসেবে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার শিক্ষা দিয়েছেন। নামায মানুষকে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে সত্যের পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

০ রোযার শিক্ষা

মহানবী (সা) মানবীয় কু-প্রবৃত্তিগুলো দমন করার জন্য এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তাক্ওয়া জাগ্রত করার লক্ষ্যে একমাসের দীর্ঘ সিয়াম সাধনার শিক্ষা দান করেন। এ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে খোদাভীতি পরস্পর হামদরদী এবং দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয়।

০ হজ্জের শিক্ষা

একজন ভক্তপ্রাণ বান্দা মহান আল্লাহর প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার মানসে পবিত্র কা'বা গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করার মহড়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও বান্দার সাথে সুনিবিড় সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। তা ছাড়া এ মহাসম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অনুপম বন্ধনের সৃষ্টি করে আর সকলকে শিক্ষা দেয় একতা, ঐক্য, সাম্যের মূলমন্ত্র-যা চির অক্ষয়, চির-অবিনশ্বর।

০ যাকাতের শিক্ষা

মহানবী (সা) যাকাতের শিক্ষা দিয়ে একদিকে যেমন ধন-সম্পত্তিকে পূতঃপবিত্র ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করার ব্যবস্থা করেছেন তেমনি অভাবী ও নিঃস্ব মানুষের অভাব মোচনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সম্পর্কে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করে অভাবনীয় শান্তি-শৃংখলা ও সম্প্রীতির সমাজ গড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

৭. ইসলামই মানবতার মুক্তি সনদ

মানবতার মহানবী (সা) মানব জাতিকে শিক্ষা দিলেন ইসলামই বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ। মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যার অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে স্বর্গীয় সুখ-শান্তির ফলগুধারা এ ধূলির ধরণীতে থেকেই।

মহানবী (সা) ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন যার নজীর বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো জীবনে মিলেনা। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার ধর্মীয় শিক্ষা চির সুন্দর, নিত্য-সত্য নির্ভেজাল ও অম্লান দীপ্তিতে সদা দেদীপ্যমান- যা সর্বকালের সর্বদেশের বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির গ্যারান্টি দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ করুন-

ক. সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বস্রষ্টা মহান একক সত্তা আল্লাহ তায়ালার ------- বা ------ শিক্ষা -------- কোথাও ছিল না।

খ. মহানবী (সা) যুগ যুগ ধরে লালিত ------- ও ------- মূলে কুঠারাঘাত হানেন।

গ. অন্ধকার যুগে এক শ্রেণীর লোকদের ধারণা ছিল, ভাল কাজ করলেই স্বর্গে যাওয়া যাবে না, বরং স্বর্গের ধর্মের চাবিকাঠি একমাত্র ----- হাতে।

ঘ. মৃত্যুর পর সবাই- হবে এবং স্বীয় কৃতকর্ম ফলের অনুসারে ----- বা ------ অনন্তকাল অবস্থান করবে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবী (সা) এর ধর্মীয় শিক্ষা কী ছিল?

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবীর (সা) শিক্ষা কী?

৩. শিরক ও যাজক তন্ত্রের অবসানে মহানবীর (সা) সংস্কার লিখুন।

৪. আল্লাহর ইবাদতের জন্য মহানবীর (স) শিক্ষা কী?

পাঠ ৩ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে খ্রিস্টীয় ৬শ' শতাব্দী বিশ্ব-মানবতার এক দুর্যোগপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। গোটা বিশ্বসহ আরবের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত ছিল। মরুময় আরবে কৃষির মাধ্যমে আয়-উপার্জন ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েত সামান্য। মরুবাসী আর বেদুইনরা তাই পশুচারণ, লুট-তরাজ এবং শহরাঞ্চলে ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করত। জাতীয় সম্পদের বেশীরভাগই বিত্তশালী ও সুদখোর ইহুদীদের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল। তাদের চড়া ও চক্রবৃদ্ধিহারের সুদ ব্যবস্থার নি□ষণে সর্বস্বান্ত আরববাসীরা যখন দিশেহারা- এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে হযরত মুহাম্মদ (সা) নবী ও মানবতার মুক্তির দিশারী হিসেবে আবির্ভুত হন।

মহানবী (সা) অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে একটি চিরকল্যাণমুখী সুষম অর্থব্যবস্থা চালু করেন। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতন বন্ধ হয়ে একটি আদর্শ সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠে।

মহানবীর (সা) প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ

৩.১ অর্থোপার্জন নিয়ন্ত্রণ

মহানবী (সা) আল্লাহর নির্দেশ সর্বপ্রথম সম্পদ উপার্জনের পন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর নির্দেশ :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করোনা।"

এ ঘোষণা দ্বারা অর্থ-আয়ের অবৈধ উৎসমূহকে বন্ধ করে দিলেন। যেমন–

পরস্পর অপহরণ, তথা চুরি, ডাকাতি, লুট-তরাজ, হাইজাক, প্রতারণা দ্বারা অর্থ উপার্জন ইত্যাদি বন্ধ করে দিলেন।

ঘুষকে অবৈধ ঘোষণা করেন। যেমন- মহানবীর ঘোষণা–

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِى كِلَاهُمَا فِىْ النَّارِ

"ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।"

প্রতারণা দ্বারা অর্থ আয়ের যাবতীয় উৎস বন্ধ করে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন।

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্যে কিংবা অন্য যে কোন ধরনের প্রতারণা-প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে চিরতরে অবৈধ ঘোষণা করেন।

মজুদদারী ও কালোবাজারী বন্ধ ঘোষণা করেন : এ প্রসংগে মহানবী (সা) বলেন-

مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِه لَمْ يَكُنْ لَه كَفَارَةٌ

"চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয়, তবু এ অপরাধ ক্ষমা করা হবেনা"। এ ঘোষণার মাধ্যমে বাজারে সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অধিক মুনাফাকুরী-মজুদদারী ও কালোবাজারীর মনোবৃত্তি চিরতরে খতম করে দেয়া হয়েছে।

সুদ একটি জঘন্য সামাজিক অর্থনৈতিক অপরাধ। এর মাধ্যমে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরীব আরো গরীব হয়। আল্লাহ তায়ালা তাই এ অমানবিক অর্থ-উপার্জনের কু-প্রথাকে হারাম ঘোষণা করে বলেন -

وَحَرَّمَ الرِّبٰى

"আর আল্লাহতায়ালা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।"

জুয়া-লটারী ইত্যাদি প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মদ-শুকুর ইত্যাদি অবৈধ বস্তুর ব্যবসায়ও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

৩.২ হালাল উপার্জনকে উৎসাহিতকরণ

হালাল ও বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনকে উপৎসাহিত করা হয়। সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী :

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

"ব্যবসাকে আল্লাহ হালাল করেছেন"

মহানবী (সা) কায়িক পরিশ্রম করে কিংবা নিজ চিন্তা-ভাবনা ও মস্তিষ্ক খাটিয়ে বৈধভাবে অর্থ-উপার্জনকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন-

"নিজ শ্রমে ব্যবসায়ী কিয়ামতে শহীদদের সাথে অবস্থান করবেন।"

মহানবী (সা) শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকের অধিকার স্বীকার করে ঘোষণা করেন– "যারা কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাও, তাদেরকে তাই খেতে দেবে। তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তাই পরিধান করতে দেবে।" মহানবী (সা) আরো ঘোষণা করেন - "সর্বোত্তম আমল হলো বৈধ পন্থায় উপার্জন করা।"

৩.৩ অর্থ-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

মহানবী (সা) অর্থোপার্জনের উৎসগুলো নিয়ন্ত্রণ করার পর অর্থ ব্যয়ের খাতগুলোও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন।

অপব্যয় রোধ : মহানবী (সা) ঘোষণা করলেন- বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদও নিজের খেয়াল খুশীমত ব্যয় করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন -

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

"তোমরা পরিমিতভাবে খাও ও পান কর; কিন্তু অপব্যয় করো না।"

কারণ, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। এ ঘোষণার সাথে সাথে আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনে অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সে সময় মদ-জুয়া ইত্যাদি গর্হিত ও সমাজ বিরোধী কাজে অর্থ ব্যয় করে তারা অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছিল। মহানবী (সা) এ সকল অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ মর্মে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূর্জার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক বাজি (লটারী) ঘৃণ্য শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এ সকল বর্জন কর- যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।"

সুপথ ও কল্যাণের পথে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে আদেশ দিয়ে বলা হয় যে, এ সকল ব্যাপারে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং মিতব্যয়ী হতে হবে। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেন– "আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না বা আবার কৃপণতাও করেনা, বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় আছে। "

৩.৪ অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের নির্দেশ

মহানবী (সা) ক্ষেত্রে যার যা প্রাপ্য ও অধিকার রয়েছে; যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে যতটুকু পাবে তাকে তার প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দাও।এ ক্ষেত্রে গড়িমসি করা ঠিক নয়।

সমাজে যারা অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম, দুঃস্থ ও বিপন্ন, যেমন গরীব-মিসকিন, দুঃখী, ইয়াতীম পথিকদেরকে যথাসম্ভব অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

সদকায়ে জারিয়াহ বা জনকল্যাণমূলক খাতে যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, সেতু, রাস্তা–ঘাট ইত্যাদি নির্মাণে অর্থ ব্যয় করার জন্যও মহানবী (সা) উৎসাহিত করেছেন। কোন অন্যায় ও অবৈধ এবং মানবতার অকল্যাণকর খাতে অর্থস-সম্পদ ব্যয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আর সঠিক ও বৈধ এবং মানবতার কল্যাণমূলক খাতে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে বলে অর্থনৈতিক অংগনে অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন।

৩.৫ অর্থসঞ্চয়ে নিষেধাজ্ঞা

মানবতার দরদী বন্ধু নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর অথনৈতিক বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য আরো একটি দিক হচ্ছে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বিপন্ন মানবতার কল্যাণে তথা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করে কেবল সঞ্চয় তহবিল গড়া যাবেনা। কৃপণের মত সম্পদ কুক্ষিগত করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা যাবে না। আল্লাহর পথে ব্যয় না করে সম্পদকে যারা সঞ্চয় করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী- "আর যারা সোনা-রুপা , অর্থ, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে অথচ আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।"

তবে বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় খরচ করার পর যদি অর্থ সঞ্চিত হয়, তাতে কোন দোষ নেই।

৩.৬ অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন

মহানবী (সা) আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে একটি কল্যাণমূলক ও সুষম অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছেন। এ ইসলামী অর্থনীতিকে পাঁচটি চিরন্তন বিভাগে রূপদান করা হয়েছে। যেমন-

১. যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন

যাকাত হচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এটা মুসলিম ধনীদের ওপর ধার্যকৃত দরিদ্র-কর। যাকাতের অর্থ আল্লাহ নির্দেশিত ৮টি খাতে ব্যয় করা হয়। খাত আটটি হচ্ছে-

(ক) দারিদ্র দূরীকরণ

(খ) মিসকিনদের (নিঃস্ব) অভাব মোচন,

(গ) ঋণ মুক্তি,

(ঘ) নও মুসলিম পুনর্বাসন,

(ঙ) বিপন্ন প্রবাসী মুসাফিরের সাহায্য,

(চ) প্রশাসনিক ব্যয়,

(ছ) দাসত্বের শৃংখল মুক্তি,

(জ) আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদে।

২. খারাজ ও উশর

ভূমি কর ও ফসল কর ব্যবস্থা চালু :

খারাজ বা ধার্যকৃত ভূমিকর যা সাধারণত সামরিক বিভাগে ব্যয় করতে হয় আর উশর বা ফসলকর যাকাতের খাতে ব্যয়িত হবে।

৩. গণিমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ, যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক উপায় উপকরণ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পদ যা পাঁচভাগে বণ্টিত হবে। এর চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং এক ভাগ বায়তুল মালে জমা হবে। যা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে।

৪. জিযিয়া কর চালু

অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্যকৃত নিরাপত্তা কর যা সামরিক বিভাগের খরচ হবে।

৫. আল-ফাই

এটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে উৎপাদিত আদায়কৃত কর, যা অভাবী জনসাধারণ ও দেশের কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হবে।

৬. সাদকাহ ও ফিৎরা

রামযান মাসে সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর "সাদাকাতুল ফিতর" বাধ্যতামূলক করে দিয়ে অভাবীদের আনন্দ উৎসবের খরচ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং সাদকা বা সাধারণ দান করার প্রতিও মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়। যাতে দরিদ্রতার অভিশাপ হতে সমাজ-সভ্যতা বাঁচতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

তৎকালীন বিশ্বে তখন আরবসহ সর্বত্র অসম ও নৈরাজ্যকর অর্থ ব্যবস্থার নি□ষণে বিশ্বমানবতা ছিল বিপন্ন। মহানবী (সা) এ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ এক অর্থ ব্যবস্থা চালু করেন। হালাল ব্যবসায় বাণিজ্য, যাকাত, উশর, খারাজ, ফিৎরা, সাদকাহ, জিযিয়া, কর ইত্যাদি প্রবর্তন করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব ভাল/ অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।
২. মরুবাসী আরব বেদুইন ব্যবসায়-বাণিজ্য / লুট-তরাজ করে জীবিকা চালত।
৩. তোমরা পর□রের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ / বৈধভাবে আত্মসাৎ করো না।
৪. ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ই /একজন জাহান্নামী।
৫. আল্লাহ ব্যবসায়কে হারাম / হালাল করেছেন।
৬. সুদ একটি লাভজনক ব্যবসায় / অসামাজিক অপরাধ।
৭. সর্বোত্তম আমল হল বৈধ পন্থায় উপার্জন করা / মসজিদে বসে আল্লাহ আল্লাহ করা।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবীর (স) অর্থনৈতিক সংস্কারের তিনটি দিক উল্লেখ করুন।
২. অর্থোপার্জন বিষয়ে মহানবীর (স) সংস্কারের দিকগুলো কী কী?
৩. অর্থ-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মহানবীর (স) শিক্ষা কী?
৪. অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মহানবীর (স) শিক্ষা লিখুন।
৫. মহানবী (স) কিভাবে অর্থনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছেন?

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রাজনৈতিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (সা) এর রাজনৈতিক সংস্কার বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবের পূর্বকালীন যুগে গোটা বিশ্বসহ আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যমূলক, বিশৃংখলাপূর্ণ এবং ভয়াবহ। গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জোর যার মুল্লুক তার এ সন্ত্রাসবাদী নীতিতেই তদানীন্তন রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ হত। গোত্রকলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানা-হানি লেগেই থাকত। কেন্দ্রীয় শাসন বা নিয়ন্ত্রণ বলে কিছু ছিল না। রাজনৈতিক এমনি শোচনীয় দুর্দিনে আবির্ভূত হলেন মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনি নৈরাজ্যপূর্ণ আরব ভূমিতে যে অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা

মানুষের মনগড়া আইন ও নৈরাজ্যপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠা করে মহানবী (সা) আরব উপমহাদেশে কাংখিত শান্তি স্থাপন করেন। মহানবী (সা) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে : "আল্লাহ তা'য়ালা যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী তাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করো। এ ব্যাপারে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা।" আর মহানবী (সা) তাই করলেন। এরই ভিত্তিতে তিনি গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। যেমন-

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

বিশ্বনবী (সা) প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলাকে নিরংকুশ একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী- "আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব কেবল আল্লাহর। তার সার্বভৌমত্ব আসমান ও যমীনের সর্বত্র বিস্তৃত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম বা বিধান দেবার অধিকার নেই।"

আল-কুরআনকে সংবিধান ঘোষণা

মহানবী (সা) আল-কুরআনকেই ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ঘোষণা করেন। তিনি এরই নীতি ও আদর্শের নিরিখে রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন।

লিখিত সংবিধান বা সনদ প্রণয়ন

মহানবী (সা) আল-কুরআনের নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে একে বলা হতো 'মদীনার সনদ'। আর এটাই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। এ সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। এসনদে ধর্ম বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা) কুরআনের বিধান, স্বীয় সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক অংগনে তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। গোত্রে গোত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির শাসন চলত। গোত্র প্রধানই ছিল দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। তাই সমাজে শান্তি-শৃংখলা ছিল না। মহানবী (সা) এ গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেন। এটাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের জন্য তিনি মদীনাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। আর তারই মাধ্যমে শতধা বিভক্ত বিবদমান গোত্রগুলোকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে সংহতি ও শান্তি স্থাপন করেন।

মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন বিশ্বে গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা ছিল না। "জোর যার মুল্লুক তার" এ নীতির অধীন দুর্বলরা সর্বদা সবলদের হাতে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হত। মানবতার দরদী নবী (সা) ঘোষণা করলেন, সকল

নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমান। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-নীচু, আশরাফ-আতরাফ, ইসলামের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সকল নাগরিকই মৌলিক অধিকার সমানভাবে ভোগ করবে।

অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা) অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল, মান-সম্মান এবং নিজস্ব ধর্মাচার পালনের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা বিধান করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের নিয়ে এক সাথে শান্তিতে বসবাস করার প্রচেষ্টা মানব ইতিহাসে এই প্রথম। পাশ্চাত্য মনীষী স্মীথ যথার্থই বলেছেন, "পৃথিবীতে যদি কেউ অমুসলিমদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবী করতে পারে, তবে তিনি একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কেউ নন।"

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

জাহিলী যুগে অন্যায়-অবিচার, যুলুম ও অপরাধ প্রবণতার গঠনমূলক কোন বিচার বা শাস্তির ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে অপরাধ প্রবণতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করে। দুর্বলরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছিল সবলদের হাতে। হযরত মুহম্মদ (সা) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ হতে অপরাধ প্রবণতা চিরতরে বিলোপ করেন।

সুসংহত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা) সুসংহত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। এ জন্য তিনি শাসনকর্তা বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। প্রদেশগুলো ছিল : মদীনা, মক্কা, তায়েফ,তায়ামা, সানআ, খায়বার, ইয়ামেন, হাজরা-মাউত, ওমান এবং বাহরাইন। রাজধানী মদীনার মসজিদে নব্বীতে বসে তিনি প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্র প্রধানের শাসনকর্তার কার্যাবলী সম্পাদন করতেন।

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিতে বসবাস করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সৎ ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। "যুদ্ধ নয় শান্তি" এ ছিল তার পররাষ্ট্র নীতি। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের ছোট বড় রাষ্ট্র এবং গোত্রের সাথে সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' ও 'মদীনা সনদ' ইত্যাদি এর প্রমাণ।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে সংস্কার করেছেন এবং যে শিক্ষা রেখে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তিনি একটি শাশ্বত ঐশী ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনার মাধ্যমে নৈরাজ্যপূর্ণ আরবসহ গোটা বিশ্বকে বিশ্বমানবতার চির কাঙ্খিত আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধান দেন। তিনি যে ইসলামী রাজনৈতিক শিক্ষার অনুপম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা চির শাশ্বত। আর তার অনুসরণেই আসতে পারে বর্তমান ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তির ফলগুধারা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. রাসূলুল্লাহর (স) আবির্ভাবের পূর্বকালীন যুগের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
২. তখনকার রাজনীতি কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত?
৩. পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সনদ বা শাসনতন্ত্র কোনটি?
৪. প্রাক ইসলামী যুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল কী?
৫. অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর ভূমিকা কী ছিল?
৬. সুসংহত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মহানবীর (সা) কী উদ্যোগ গ্রহণ করেন?
৭. মহানবীর (স) পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক সংস্কার বর্ণনা করুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক শিক্ষাসমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সামাজিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সামাজিক সংস্কার বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহানবীর (সা) সামাজিক শিক্ষা উল্লেখ করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্ব যুগে গোটা বিশ্বসহ আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত জঘন্য ও শোচনীয়। গোত্র-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, সামাজিক বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা সমাজ। সামাজিক সাম্য, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা বা মানব মর্যাদার কোন বালাই ছিল না। জঘন্য দাসত্ব প্রথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, অন্যায়-অনাচারের চরম তাণ্ডবতায় সমাজ কাঠামো ধ্বসে পড়েছিল। এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব। মহানবী (সা) ঐ সকল যাবতীয় অরাজকতার মূলোৎপাটন করে যে বৈপ্লবিক সামাজিক সংস্কার সাধন করে একটি সুন্দর শান্তিময় আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সত্যি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর মত এমন সংস্কারক আর দৃষ্ট হয় না। বিশ্বের বড় বড় মনীষীগণ মহানবী (সা) প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারসমূহকে এক অতীব স্মরণীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামাজিক সংস্কারে মহানবীর (সা) বৈপ্লবিক কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ–

তাওহীদের আদর্শে সমাজের পত্তন

ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা অনাচার-পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমগ্র সমাজকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তাওহীদের আদর্শে সমাজকে নবরূপে রূপায়িত করেন। সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহকে মেনে নিয়ে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন।

মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন

সামাজিক সাম্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্ব মানবতার ভিত্তিতে তিনি যে উন্নত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। তিনি অন্ধ আভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে মানবতার অত্যুজ্জ্বল আদর্শে সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করেন।

সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই থাকত। সামান্য অজুহাতে ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। আর তা দীর্ঘকাল যাবত দাবানলের মত জ্বলতে থাকত। রক্তপাত ও লুণ্ঠন ছিল তাদের নিত্য পেশা। মহানবী (সা) এ সকল অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে শান্তি ময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাক-নবুয়ত হিলফুল ফুযুল এবং পরে মদীনা সনদের মাধ্যমে সমাজে শান্তি আনয়নে সক্ষম হন।

শ্রেণীহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠন

শুধু জন্মগত, বংশগত কিংবা ভাষাগত বা আঞ্চলিকতার বিচারে কোন মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য মহানবী (সা) স্বীকার করতেন না। তাঁর ভাষায়- "সকল মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী।" এ নীতির ভিত্তিতে মহানবী (সা) সমাজকে ঢেলে সাজান।

ঘৃণ্য দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ

ঘৃণ্য দাস প্রথার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন। জাহিলী যুগে পণ্য দ্রব্যের মত দাসদাসীও হাটে বাজাতে বেচাকেনা হত। তাদের কোন স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। মহানবী (সা) বহু যুগ ধরে প্রচলিত এ অমানবিক প্রথা উচ্ছেদ করে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা দান করেন। তিনি কৃতদাস আযাদ করে পুত্র বরণ করেন এবং পরবর্তীতে যায়েদকে মুসলিমদের সেনাপতিত্ব দান করেন। তিনি হাবশী কৃতদাস বিলালকে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেন- "দাস দাসীদের মুক্তিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কার্য আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।"

নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা দান

মহানবী (সা)-এর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি। ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। মহানবী (সা) সর্বপ্রথম নারীজাতির আর্থ-সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করে সম্মান ও গৌরবের আসনে সমাসীন করেন। তিনি মহান আল্লাহর সাম্যের বাণী প্রচার করে বলেন- "পুরুষের নারীর ওপর যতটা অধিকার আছে, নারীরও পুরুষের ওপর ততটা অধিকার রয়েছে।" বিবাহ, বিধবা বিবাহ, তালাক, স্বামী ও

পিতৃসম্পত্তিতে অধিকার দান করে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। স্ত্রীদের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তিনি বলেন- "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত" এভাবে তিনি নারী জাতির মুক্তির অগ্রনায়ক হিসাবে বিশ্বের বুকে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

ভিক্ষা বৃত্তির উচ্ছেদ

মহানবী (সা) ভিক্ষাবৃত্তি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি মানবতার শ্রেষ্ঠ হাতকে খাট করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সকলকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন। "নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত করো সবে"-এ ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান।

অশ্লীলতা ও অনাচার উচ্ছেদ

মহানবী (সা) সমাজ থেকে যাবতীয় সামাজিক অশ্লীলতা, অনাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, তথা যাবতীয় চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ উচ্ছেদ করে এক সুস্থ কল্যাণময় পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আর্থ-সামাজিক অসাধুতা দূর

মহানবী (সা) আর্থ-সামাজিক অসাধুতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, হঠকারিতা, মজুদদারী, কালোবাজারী, ইত্যাকার যাবতীয় অনাচার হারাম ঘোষণা করেন। তিনি এগুলো সমাজ থেকে উচ্ছেদ করেন এবং একটি সুন্দর পবিত্র সমাজ ব্যবস্থা উপহার দেন।

সার-সংক্ষেপ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অধঃপতিত আরব সমাজ মহানবী (সা)-এর সংস্কার প্রচেষ্টায় এক নবচেতনায় নববিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সুন্দর পুত-পবিত্র শান্তিময় আদর্শ সমাজের রূপলাভ করে। একারণেই মহানবী (সা)-কে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক হিসাবে অভিহিত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. বিশ্বের মনীষীগণ মহানবী (স) প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারকে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?
২. কিসের ভিত্তিতে মহানবী (স) সমাজের পত্তন করেন?
৩. মহানবী (স) কোন আদর্শে সমাজ গঠন করেন?
৪. শ্রেণীহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে মহানবীর (স) শিক্ষা কী?
৫. ঘৃণ্য দাসত্ব প্রথার ব্যাপারে মহানবীর (স) শিক্ষা কী?
৬. নারী-জাতির সামাজিক মর্যাদা কিভাবে দিয়েছেন?
৭. মহানবী (সা) কী ভিক্ষা বৃত্তি চালু করেন?
৮. অশ্লীলতা ও অনাচারের ব্যাপারে মহানবীর (স) শিক্ষা কী?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর সামাজিক সংস্কার বর্ণনা করুন।
২. মহানবীর (স) সামাজিক শিক্ষা উল্লেখ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১২

১. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কার লিখুন।
৩. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কারসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক শিক্ষাসমূহের বিবরণ দিন।
৫. মহানবী (স)-এর সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা বর্ণনা করুন।

নমুনা প্রশ্ন

ইসলাম শিক্ষা

প্রথম পত্র

এইচএসসি প্রোগ্রাম

বিষয় কোড : HSC–1807

পরীক্ষার সময় ৩ ঘন্টা পূর্ণমান - ১০০

ক বিভাগ-

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন : (যে কোন ৮টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর ৫*৮=৪০

১. ইসলামী শিক্ষার পরিচয় দিন। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

২. ইসলাম কী? ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. বিশ্ব সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান উল্লেখ করুন।

৪. মানবজীবনে উন্নতির উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

৫. হালাল উপার্জন কী? হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন এবং হালাল উপার্জনের উপায়সমূহ লিখুন।

৬. সন্তানের প্রতি মাতাপিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? বর্ণনা করুন।

৭. সামাজিক সমস্যা সমাধানে মসজিদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তার একটি চিত্র তুলে ধরুন।

৮. অপরের অধিকার হরণ বলতে কী বুঝায়? ইসলামের দৃষ্টিতে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-এর শাস্তির বিধান বর্ণনা করুন।

৯. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও বিনিয়মনীতি আলোচনা করুন।

১০. ইসলামে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কী? ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।

খ বিভাগ-

বিশদ উত্তর-মূলক প্রশ্ন : (যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর ৫×১২=৬০

১১. (ক) সৃষ্টির সেবায় মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

(খ) "আখিরাত বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ"– এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) বেহেস্ত কী? বেহেস্তের স্তর কয়টি ও কী কী? লিখুন।

(ঘ) মহানবী (স) এর সামাজিক সংস্কার বর্ণনা করুন।

(ঙ) উশর বা জমির ফসলের যাকাতের নিসাব সম্পর্কে লিখুন।

(চ) ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় পরিচয় লিখুন।

(ছ) ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকগণ কী কী অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকেন?

(জ) ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী লিখুন।

(ঝ) "মিথ্যা ঘৃন্যতম অপরাধ"- ব্যাখ্যা করুন।

(ঞ) জুয়া ও লটারীর কুফল বর্ণনা করুন।

(ট) ইসলামী সমাজের বৈশিস্ট্যসমূহ লিখুন।

(ঠ) ইসলামী সমাজব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? লিখুন।

(ড) স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য বলতে কী বোঝায়? লিখুন।

(ঢ) সবরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উল্লেখ করুন।

(ণ) গণিত বিজ্ঞানের অগ্রদূত হিসেবে মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খারিযমীর অবদান মূল্যায়ন করুন।